সৃজন

অনন্তের দিকে

সোমনাথ ভট্টাচার্য

এত নীল আমি কোথায় যে রাখি-
আকাশকে বলেছিল নদী।
সেই কথা শুনে গাছপালা,
ঢেকে দিল নদীটির বুক।
এত সবুজই বা রাখবো কোথায়?
নদীর বায়না শুনে রোদ এসে,
জাফরি আঁকলো সাদা কালো -
নদীটির বুকে।
ছায়া-রোদে সবুজে ও নীলে
সাজুগুজু সংসার পাতে নদী।

এসবে স্রোতের কিছু এলো গেল না।
সে জেনেছে,
সব ছেড়ে তাকে যেতে হবে সাগরের কাছে।
যেখানে অনন্ত আছে তারই অপেক্ষায়।

সিম্ফনী

বীরেশ ঘটক

যত সত্বরই আসুক সত্তর
তখন সকাল।
কবির অভিনিবেশ
সৃজনের গভীর অতলে...

বাতাসে বিজয়া-গন্ধ
ধ্যান ভেঙে পাশ ফিরতেই
চোখের চমকে চমৎকার।
অনাবিল একান্ত ইশারা
নিষিদ্ধ ফলের হাতছানি।

ছোঁয়ামাত্র বাতাসে আকাশে
বেজে ওঠে অবরুদ্ধ স-র-গ-ম
স্বর্গীয় সিম্ফনি...

তুমি আছো বলেই

শৈলেশ কুমার দে

তুমি আছো বলেই -
ভাবনারা আজো একাকী দাবার গুটি সাজায়,
কবির ও কবিতার অন্তস্থলে রক্তক্ষরণ ঘটায়।
তুমি আছো বলেই -
সিঙ্গুর এখনও শিল্পের স্বপ্ন দেখতে ছাড়েনি,
অসহিষ্ণুতার কালো মেঘ রঙ ঢাকতে পারেনি।
তুমি আছো বলেই -
সবুজে-সবুজে জীবনানন্দরা ফিরে-ফিরে আসে,
বসন্তের আবীর মাটিতেই নয়, অন্তরেতেও ভাসে।
তুমি আছো বলেই -
সিগারেটের ধোঁয়া আজো লুকিয়ে চুরিয়ে ছাড়ি,
সমস্ত পেগ গুটি গুটি পায়ে লজ্জায় ফেরে বাড়ি।
তুমি আছো বলেই -
সন্তানকে এখনও দিন বদলের স্বপ্ন দেখাতে ভুলি না,
আজো প্রতিবাদ কলমেই রাখি অস্ত্র হাতে তুলি না।
তুমি আছো বলেই -
অপেক্ষারা আজো ধৈর্য্য হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়নি,
যুক্তির কাঠামো বিজ্ঞানে বাঁধে, ধর্মের বিষ খায়নি।

স্বামীজির ভারতবর্ষ

শুভঙ্কর ব্যানার্জি

বিবেকানন্দ নাম যে তোমার
তুমি পরম পূজনীয় স্বামীজি;
জীবনযাত্রায় রসদ জুগিয়ে
জাগাও মানবপ্রকৃতি।
বিবেকানন্দ নাম যে তোমার
তুমি সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের বাণী;
বিশ্বমায়ের কোলে আজও অনাহারী শিশু
হে স্বামীজি! কোথাও আবার ঘুমন্ত প্রাণী।
বিবেকানন্দ নাম যে তোমার
তুমি আধ্যাত্মবাদের জ্বলন্ত প্রতীক
আগামী ভারতবর্ষ গৌরবময় হোক!
প্রজ্জ্বলিত হোক জীবসেবার দীপ।

দুটি অনুগল্প

ফার্স্ট বয়

রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

— হ্যালো... খোকা, কেমন আছিস? কখন থেকে চেষ্টা করে তোকে ধরতে পারলাম। ফোন ধরিস না কেন বাবা?

— মা, বে-টাইমে ফোন করলে ধরব কী করে বলো? তোমাকে অনেকদিন বুঝিয়েছি এটা আমাদের দেশের উল্টো পিঠ। ওখানে যখন দিন, এখানে তখন রাত।

— তোকে নিয়েই তো আমার যত দুশ্চিন্তা। হ্যাঁরে... ঘরের বাইরে বেরোচ্ছিস না তো ? ওদেশে তো শুনছি কাতারে কাতারে লোক মরছে। টিভিতে বলল সংখ্যাটা নাকি দু'লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এত উন্নত দেশ অথচ চিকিৎসার একি হাল ? কী যে এক করোনা রোগ এল দুনিয়ায়!

— তোমার ভয় নেই মা। আমি ভালোই আছি। ঘরে বসে অনলাইনে খাবার-দাবার, প্রয়োজনীয় জিনিস সবই পৌঁছে যাচ্ছে। অফিসের কাজও ঘরে বসে করছি। এদেশে অনেক দেরিতে লকডাউন জারি হয়েছে। কিছু লোক গোঁয়ার্তুমি করে মাস্ক না-পরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লকডাউন মানছে না। গভর্নমেন্টের কোনো কন্ট্রোল নেই। হসপিটালগুলোতে করোনা-ওষুধের সাফিশিয়েন্ট স্টক পর্যন্ত নেই। তাই দেদার লোক মরছে।

— তোর বাবা বলে, কেন যে মরতে ছেলেটাকে চাকরি করতে ওদেশে পাঠালাম।

— এখন আর এসব ভেবে কী লাভ বলো! তোমরাই তো একদিন বলেছিলে, প্রথম বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ। যারা গোটা পৃথিবীটাকে শাসন করে সেই প্রাচুর্যের দেশে ডলার কামানোর এমন সুবর্ণ সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে? দেখলে তো একটা জীবাণু এসে সবার ওপর দাদাগিরি করা দেশটার ভেতরটা কেমন হাওদাখানা করে দিয়ে গেল। সভ্যতার ফার্স্ট বয় একটা রোগের সঙ্গে যুদ্ধে একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে যাচ্ছে।

— তুই সাবধানে থাকিস বাবা। রোজ ফোন করতে ভুলিস না।

— হ্যাঁ হ্যাঁ... তোমরাও সাবধানে থেকো। ঘরের বাইরে বেরিও না। রাখলাম।

ল্যান্ডমার্ক

রতন শিকদার

আমরা দুজন একই গলিতে থাকি। আমার বাড়ির দুটো বাড়ি পেছনেই তার বাড়ি। তার আর আমার অফিসে যাবার সময়টাও প্রায় একই। আমি রোজ তার পেছনেই থাকি। ভালো লাগে তার গড়ন, চলনও আমাকে টানে, তাই বরাবর আমি তার পিছু নিই। কখনও তাকে কথা বলতে শুনিনি। আমার বিশ্বাস তার গলা শুনলে বোধহয় তার সুরেলা কথায় আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। তার বাঁ-হাতের দামি মোবাইলটা কখনও উঠে যায় কানে। ফোনটা কানের লতির ওপরে লেপটে থাকা মুক্তোর দানাটাতে ছুঁইয়ে রেখে অনর্গল কথা বলে চলে সে। বড়ো রাস্তায় শহিদবেদিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই একটা ওলা ক্যাব এসে ওর সামনে থামে। চোখের নিমেষে সে ওটায় চেপে উধাও হয়ে যায়। শহিদবেদি স্টপে আমি মিনিবাসের অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি।

আমি খেয়াল করেছি ও কোনোদিনও তাকিয়েও দেখে না ওই লান্ডমার্কটার দিকে। কেউই তাকায় না। সবাই ভুলেই গেছে কার স্মৃতিতে কবে ওটা তৈরি হয়েছিল। ওটা এখন শুধুই একাট ল্যান্ডমার্ক।

বেইমান কুকুর

রাজদীপ মণ্ডল
(রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ, ঘোলা পঞ্চম শ্রেণি)

আমি একদিন হেঁটে হেঁটে মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে পড়তে যাচ্ছিলাম। এইসময় দেখলাম রাস্তার পাশে কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। আমি সেইদিকে অকপটে তাকিয়ে আছি। আর মনে মনে ভাবছি, মা একদিন আমাকে বলেছিল, কুকুর নাকি ত্রিনাথ, বাবা লোকনাথ, স্বয়ং ভগবান। তাহলে রাস্তার কুকুরগুলোর এই দশা কেন? না-খেতে পেয়ে তাদের পেটগুলো একদম চিমসে গেছে। দেখে মনে হয় কতদিন খায়নি। মায়ের কথায় যদি সত্যি কুকুর ভগবান হয় তাহলে ভগবানগুলো এইভাবে না-খেয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। মন্দিরের ভগবান কত যত্ন পায়, কত খাবার পায়! আমাদের ঘরের গোপালকে মা কত কি খেতে দেয়, স্নান করায়। অথচ মন্দির বা ঘরের সিংহাসনের ঠাকুর সবাই তো হয় মাটির, নয় পাথরের, নয় ধাতু দিয়ে তৈরি। এক কথায় জড় পদার্থ। তার জন্য মানুষের কত চিন্তা, কত ভাবনা। অথচ কুকুরগুলো জ্যান্ত ভগবান হয়ে তাদের কী দশা। এমন ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটি কুকুর আমাকে যেন ডাকছে —

কুকুর : রাজ, এই রাজ শোন! তুই ঠিক কথাই বলেছিস রে। এই লকডাউনের দিনে মানুষের জন্য প্রশাসনের কত ভাবনা। তাদের জন্য কত ত্রাণ, কত চাল, ডাল, গম বরাদ্দ হয়। কোনো মানুষ যেন অনাহারে না থাকে তার জন্য প্রশাসন সর্বাদায়ী সচেষ্ট থাকে। অথচ দেখ রাজ, প্রশাসনের লোক আমাদের নিয়ে সামান্যতম চিন্তাও করে না। এর কারণ কি জানিস রাজ!

রাজ : কী কারণ গো!

কুকুর : আমরা তো কারোকে ভোট দিয়ে জেতাতে পারি না। তাই হয়তো আমাদের নিয়ে প্রশাসনের কোনো মাথা ব্যথাই নেই। আর সাধারণ মানুষ, তারা শুধু মুখেই বলে, কুকুর কত ভালো প্রভু ভক্ত। বিশ্বাসী! আর মনে মনে বলে — বাপরে কি নোংরা, গায়ে কী দুর্গন্ধ! উপর উপর মানুষ আমাদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়। কিন্তু অন্তরে করে ঘৃণা।

রাজ : না গো! আমি মানুষ হয়ে বলি, তোমাদের কেউ ঘৃণা করে না। তোমারা ভুল বুঝছ।

কুকুর : আমাদের মতো তোকেও যদি মানুষ এমন ভালো ভালো বলত। তোর কি ভালো লাগত? দেখ রাজ, সবকিছু নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করতে হয়। তাহলে বোঝা যায় জীবনটা কি? আমাদের মতো গোটা সমাজ যদি তোকে ভালো ছেলে ভালো ছেলে বলত অথচ খেতেও দিত না পড়তেও দিত না। কারো বাড়িতে গেলেই দূর দূর করে তাড়াত। তখন তোর কেমন লাগত রে রাজ?

রাজ : না মানে কোনো-না-কোনো বাড়িতে তো তোমরা কিছু-না-কিছু খেতে পাও!

কুকুর : তোর দরকার দুইশো গ্রাম চালের ভাত। কিন্তু তোকে যদি কেউ দুপুরবেলা খিদের পেটে একটা-দুটো বিস্কুট দিয়ে বিদায় করে, তোর কি ভালো লাগবে?

রাজ : মোটেই না।

কুকুর : তা হলে? তোরা মুখে বলিস জীবে প্রেম।

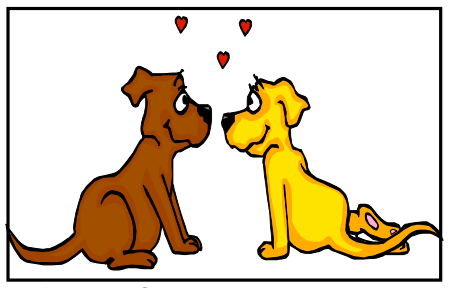

সত্যিই কি এটা জীবে প্রেম? প্রেম কোথা থেকে আসে জানিস? পেট ভরে খাওয়া থেকেই প্রেম আছে। মাথায় হাত বুলালে বা গলায় আদর করে আহারে! আহারে! করলেই প্রেম হয় না।

রাজ : দুপুরে কিংবা রাত্রে অনেক মানুষকেই তো দেখেছি তোমাদের বেশ পেট ভরেই খেতে দেয়।

কুকুর : তুই কি দিস? আমাদের জন্য কটা টাকা তুই রোজ বরাদ্দ করিস? ক্যাসেট কেনার জন্য টাকা রাখিস। আমাদের জন্য একটা টাকাও কি রাখিস?

রাজ : না... তা রাখি না।

কুকুর : নিজের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাতে ভালো লাগে।

রাজ : আর বোল না কুকুর ভাই?

কুকুর : কেন বলবো না। তোরা কি নিজের ঘরের ঠাকুর দেবতাকে না খাইয়ে রাখিস? অথচ আমাদের শিব বলিশ। যত্র জীব তত্র শিব। পাথড়ের শিবের জন্য কত খাবার। আর আমরা জ্যান্ত শিব! আমরা পেট ভরে কোনোদিন খেতে পাই না। সারারাত পাহারা দিই। সকাল হলে খিদের জ্বালায় যখন দুয়ারে দুয়ারে যাই, কপালে জোটে একটা কি দুটো বিস্কুট অথবা একটা বাসি রুটি। কেউ দেয় আবার কেউ কেউ দূর দূর করে তাড়ায়। খিদের জ্বালায় অন্য পাড়ায় যাবো তারও জো নেই। গেলেই কপালে জোটে অন্য কুকুরের কামড়। আমাদের কাছে পৃথিবীটা যেন একটা গলি বা কয়েকটা বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যখন প্রচণ্ড খিদে পায় তখন খেতে না-পেলে আমাদেরও প্রচণ্ড রাগ হয়, তখন আমরা অনেকের বাড়ির সামনে পায়খানা করে রাখি। আর মনে মনে বলি, ঠিক করেছি, খেতে দেওয়ার বেলায় ঠনঠনাঠন। আর ভালো বলার বেলায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আবার সকালে দরজা খুলেই যখন দেখে বাড়ির সামনে কুকুরের পায়খানা, তখন বলে দেখেছো কুকুরের কাণ্ড। সকাল-বিকেল খেতে দিই উঠোনে শুইতে দিই, তার বিনিময় এই! বেইমান কুকুর কোথাকার দূর হ, এ বাড়ি থেকে! সারারাত বাড়িটাকে পাহারা দিলাম দুটো বাসি রুটির বিনিময়। আর উপাধি পেলাম বেইমান!

রাজ : তোমাদের দুঃখ বুঝেছি। আমি বড়ো হয়ে তোমরা যাতে পেট ভরে খেতে পাও তার ব্যবস্থা করব। মুখে জীবে প্রেম বললেই হয় না। খেতে দেওয়াই আসল জীবে প্রেম।

কুকুর : তোর কথায় খুশি হলাম রাজ। এবার তুই পড়তে যা।

দেবদত্তা মণ্ডল
দ্বিতীয় শ্রেণি
অ্যাসেম্বলি অফ ক্রাইস্ট স্কুল, বারাকপুর

উশনা ভৌমিক
তৃতীয় শ্রেণি
নিবেদিতা বিদ্যাপীঠ

রহড়া এইট্টি এইট ডিগ্রি ইস্ট ফাউন্ডেশনের ত্রাণদান

সংবাদদাতা : রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ৮৮ সালের মাধ্যমিকের ছাত্র ওঁরা। সহপাঠীরা সহযোদ্ধা হয়ে উঠলেন পরবর্তী সময়ে। হাতে হাত ধরে গড়লেন জনকল্যাণমূলক সংগঠন 'রহড়া এইট্টি এইট ডিগ্রি ফাউন্ডেশন'। রহড়া এলাকায় করে চলেছেন নানাবিধ সেবামূলক কাজ। সম্প্রতি তাঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাখিরালয় ও ঘোড়ামারায় ঝড় বিধ্বস্ত বিপন্ন মানুষের হাতে পৌঁছে দিলেন নতুন জামাকাপড়, চাল-ডাল-সহ প্রচুর খাদ্যসামগ্রী, বেবিফুড, মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন। সংগঠনের সদস্য ডা: মানবেন্দ্র রায়, ডা: সুপ্রতিম বিশ্বাস, সমাজকর্মী অরিন্দম ধর, প্রদীপ অধিকারী, সন্দীপ ঘোষ ও কুন্তল রায়রা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ওই দুর্গত অঞ্চলে। জানা গেল, পাখিরালয়ের ৮০০ এবং ঘোড়ামারায় ২৫০০টি পরিবারের হাতে তাঁরা তুলে দিয়েছেন এই ত্রাণ সামগ্রী।

নৌকোয় করে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী।

প্রয়াণ সংবাদ

চিরবিদায় নিলেন শতবর্ষ পেরোনো সম্পাদক ও সাহিত্যিক

সংবাদদাতা : পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য একশো সাত মাস বয়েসে ২ জুন সকাল ৭-৪০ মিনিটে সম্পূর্ণ নিরোগ দেহ পরিত্যাগ করে অনন্তধামে যাত্রা করেন। মৈমনসিং গৌরীপুরে ১৯২০ সালের ১০ অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন বিখ্যাত ছান্দসিক যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য। পূর্ণেন্দু প্রসাদ মাত্র আট বছর বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হন। কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি বি.এ. পরীক্ষা দেন। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়ে বিখ্যাত শিশুসাথী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। সাহিত্য মেলা নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা নিজের খরচে সম্পাদনা করেছেন। তাঁর লেখা কবিতা, কাব্য নাট্যসহ অনেক বই আছে। চাকরি সূত্রে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সিটিটিউটে প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে ছিলেন। প্রফেসরের অবর্তমানে শ্রীমতী মহলানবীশের সেক্রেটারি হন। শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমার ভাবধারায় ছিলেন। বহু পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। তার মধ্যে শ্রী অরবিন্দ পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকারের কাছ থেকে তাম্রপত্রও তিনি পেয়েছেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মেধা, বুদ্ধি এবং বাক্ তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে। তিনি তাঁর অগনিত অনুরাগী ও গোটা পরিবার রেখে গেছেন।

করোনাস্কোপ

কোনো এক সামান্য মানুষ শ্মশানে তার দুই হাত শিকলবদ্ধ হয়ে থাকলে অনেক কাঁদবার পর কী করতে পারে? ভাববার শক্তি তার আর নেই। তাই সে পারে দেখতে। ঝাপসা চোখে। সিনেমাস্কোপের মতোই। সেই চোখে দেখতে পাওয়া দৃশ্যর খানিকটা তার যন্ত্রণা আর খানিকটা বাস্তব। এই নিয়েই করোনাস্কোপ। এইসব লেখায় জীবন্ত হয়ে ওঠা চরিত্রগুলো প্রত্যেকেই মিথ্যের মতো সত্যি, আর তাকে ঘিরে আবর্তে ঘুরতে থাকা ঘূর্ণাবর্ত সত্যির মতোই মিথ্যা। মাগজধোলাই-এর সেই ধারাবাহিক লিখনের পর আবার তুলিকলমে দর্শক **শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী**।

পর্ব ২

পঞ্চাদি

পঞ্চাদির বাড়ি ঠাকুরনগর। সেইখান থেকে এক বস্তা জবা আর গাঁদা নিয়ে আগে ফার্স্ট ট্রেনে কলকাতা আসত। আমিও ফিরতাম ওই ট্রেনেই। দেখা হয়ে যেত। পঞ্চাদি আটক্লাস পাশ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বড়ো ঘরের মেয়ে। অবশ্য তখন সে যৌবন গেছে। বয়স ষাট ছুঁইছুঁই। আমি উঠতাম বনগাঁ থেকে। তৃতীয় কামরায় আমার নিজস্ব জায়গা বাঁধা ছিল। পঞ্চাদির জন্য জায়গা রেখে দিতাম। চাঁদপাড়া পার হলেই তো। পঞ্চাদির আসল নাম কী কে জানে। ছেলে হলে ধরে নিতাম পঞ্চানন গোছের কিছু একটা হবে। মেয়ের নাম পঞ্চা কী করে হল? পঞ্চবটি ফটি হবে। অবশ্য পরে জেনেছিলাম সে নামের মাহাত্ম্য। অন্য সূত্র থেকে। সে বড়ো বেদনাদায়ক। আপাতত সে প্রসঙ্গ থাক। পঞ্চাদি ট্রেনে উঠেই ঝপাঝপ বস্তা খুলে বসবে। ফুল গাঁথবে একের পর এক। একফুট লম্বা সূঁচ দিয়ে। দুটো জবা এমুখো, তৃতীয় জবা উল্টো মুখে, চতুর্থ আড়াআড়ি। জিজ্ঞেস করলে বলত এতে বাঁধন ভালো হয়। আর কুঁড়ি ফুটলে মালাটাও বেশ খোলতাই লাগে দেখতে। আমার জন্য দ্বিতীয় সূঁচ থাকত। কামরার অন্য ফুলওয়ালিদের সঙ্গে তার তেমন বনতো না। তাই আমি তাকে সঙ্গ দিতাম। অজানা কাজ সিদ্ধহস্ত করার নেশা আমার বহুদিনের। আর তাছাড়া আরও একটা কারণও আছে বই কী। সে কারণ ঘুম তাড়ানোর। সারাদিন গাধার কাজ করার পর এই মালাগাঁথা আমাকে মাথার ব্যায়াম করাতো। ধৈর্যের পরীক্ষা। ঠিক যেন এক থেরাপি। ওই তুলসীমালা হাতা কাঠপাগলের মতো বিড়বিড় করা আমার পোষাবে না বাপু। ওসব উচ্চবর্ণের কাজ। বৈদিক যুগ হলে পদবিবাজী থাকত না। সেযুগ হলে আমি মহানন্দে নমোঃশুদ্দুর হতাম। আমি মালা গাঁথতে গাঁথতে ভাবতাম এই মালা কোনো মন্দিরে ভবতারিনীর গলায় দোল দেবে। আমার পুজো হোক এটাই। ভাবতে ভাবতেই শিয়ালদহ আসত। পঞ্চাদি ফোকলা হেসে বস্তা গোছাতো। আমিও নেমে পড়তাম। পঞ্চাদি একদিনও 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলত না।

সেদিন বনগ্রাম স্টেশনে গেলাম সন্ধ্যাবেলা। এখন এ স্টেশনে ট্রেন আসে গোপন প্রেমিকার মতো। লুকিয়ে চুরিয়ে। তাই হয়তো গাছগাছালিতে পাখি বেড়ে গেছে অনেক। প্ল্যাটফর্মে তেমন লোক নেই। কর্তৃপক্ষ ইলেক্ট্রিক বিল বাচাচ্ছেন। একটিমাত্র বাল্ব। আমার জন্য স্পেশাল ট্রেন। সেই ট্রেনে পঞ্চাদির ওঠবার অনুমতি নেই। কী করছে এখন পঞ্চাদি? কে জানে বেঁচে আছে কি না? একটা ছেলে ছিল তার। বছর পঁচিশের। একদিন দুম করে কারোকে কিছু না জানিয়েই বিভূতিভূষণ হল্টের কাছে গলা দিল। পঞ্চাদিকে এলাকার লোক 'দিদিদিদি' করত। ঠাকুরনগরের মানুষগুলো এক একজন ঠিক নাগরঠাকুরের মতো। তারা সকলে মিলে যেন একটাই পরিবার। পঞ্চাদিকে তারা একথা জানায়নি। পঞ্চাদির ছেলের ডাকনাম ছিল 'পঞ্চা'। সারাদিন বুড়ি ফুল তোলে আর ছেলেকে ডেকে বেড়ায়। 'পঞ্চা। ও পঞ্চা। আমার পঞ্চা রে...'

লক্ষীদিদি থেকে হঠাৎ একদিন পঞ্চাদি হয়ে গেল বুড়ি। এই গল্প করেছিল বুড়ির ধর্মভাই। আমার আন্ডারেই কাজ করত। অ্যামবুলেন্সের চালক। সেইসব কথা ভাবতে ভাবতেই চুপিসারে উঠে পড়লাম প্রেমিকার বুকে। সিটে বসে মনে হল সে ফুলের গন্ধ আর তেমন নেই তার বুকে। অরুণার স্টাইলে বলতে ইচ্ছে হল। তার বুকে এখন শুধুই শ্মশানে আধপোড়া শবের মাংসের গন্ধ।

সংবাদ খোলাখুলি-র ➤ *দুই পাতার পর*

দাশগুপ্ত, ধ্রুব পাল, সন্দীপ ঘোষ, অভিজিৎ মজুমদার, অনির্বাণ মজুমদার, রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কুনাল দে, তপন সরকার, প্রবীর ভৌমিক, পৌলমী বিশ্বাস, জয়া ভট্টাচার্য, সমরেশ মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম গুহঠাকুরতা, সলিল ঘোষ, মৌসুমী ভৌমিক দেবনাথ, অরুণাভ লাহিড়ী, অধীর দাস, চন্দ্রা গুহ, অধীর চ্যাটার্জি, রামকৃষ্ণ দাস, সৈকত গুহ, সঞ্জয় দাশগুপ্ত, রীতা দত্ত, প্রেমাংশু দত্ত, বিশ্বজিৎ মজুমদার, জয়া রায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, দীনবন্ধু কর্মকার, অজয় পোদ্দার, আনন্দপ্রসাদ সাহা, কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবকান্তি ভঞ্জচৌধুরী, শৈলেশকুমার দে, তপন সরকার, পিয়ালী বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শৈলেন সরকার, কেশব মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ভৌমিক, পিনাকী চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্য, মধুসূদন ধর, সঞ্জীবন রায়, বিশ্বনাথ সিনহা, স্বয়ম্ভুস্বরূপ ব্যানার্জি, প্রমথ বিশ্বাস, রঞ্জিত চন্দ, সঞ্জয় গরাই, রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা গুহ, রবীন্দ্রনাথ পাত্র, অরুণ কুমার কুণ্ডু, রূপা ধর, অরিন্দম ধর, সুমন ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ দাস, রত্না মিত্র, সুভাষ সেন (শিবু), নীহাররঞ্জন মজুমদার, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, সাথী বিশ্বাস, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন নন্দী, নিলয় পাল, কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস, অমল লস্কর, কল্যাণী চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম ঘোষ, নীতিশকুমার সাহু, রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ দত্ত, বিমলানন্দ গোস্বামী, অরুণ ভৌমিক, অনুপ দত্ত, খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, ভূমিকা গোস্বামী, তাপস ঘোষ, অতিক্রম দাশগুপ্ত, দীপক সেনগুপ্ত, কাঞ্চন বসু, শংকর দে, সুস্মিতা মিত্র, সুকেশ মণ্ডল, মিনতি রায়বিশ্বাস, বিপ্রতীপ দে।

সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে 'সংবাদ খোলাখুলি'র **উৎসবপত্র**। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রকাশিত এই উৎসবপত্রে আপনিও নিজের মৌলিক রচনা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর সময়সীমা আগামী ৩১ জুলাই।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

Email :
sangbadkholakhuli@gmail.com
ফোন ঃ **9804825063/**
7439900652

যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে গর্বের সাথে আনন্দের ঠিকানা—
মায়ের দান-কুণ্ডু বাড়ি
উত্তর বিলকান্দা, কল্যাণী রোড, কলকাতা-৭০০১১৩, যোগাযোগ :
9143038195/9836214872

মন গড়ে কবিতায়
শব্দকণা আবৃত্তি সংস্থা
মহিষপোতায় অরুণকুমার চক্রবর্তীর বাসভবনে
প্রতি শনিবার বিকেল ৫টা।
নাটাগড় পোস্ট অফিসের পাশে রতন কর্মকারের বাসভবনে।
প্রতি রবিবার সন্ধ্যে ৬টা।
আলাপন : ৯৮০৪৮২৫০৬৩/৯৮৩৬৭০৮৬৫৭

Joy Shree Ramkrishna
Jaya Roy
Govt. Lisenced Postal Savings Agent
R.D, K.V.P, N.S.C, M.I.S, T.D
Office : Natagarh post office, Kadamtala, Kolkata- 113
Mob.: 9339097094/7059113569
জয়া টী হাউস
এখানে দার্জিলিং ও আসামের সকল প্রকার চা পাতা পাওয়া যায়
(হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে) **Mob.: 9874942297**

সংবাদ খোলাখুলির
শুভানুধ্যায়ী
পঙ্কজ রায়

Whattsapp-এ
যোগ চিকিৎসা।
মোঃ ৯৭৩৩১২২৬১৭

গরাই স্টিল ফার্নিচার
এখানে স্টিলের আলমারি, খাট, শো-কেস ও অন্যান্য ফার্নিচার সুলভ মূল্যে তৈরি করা হয়। এছাড়াও ***Nilkamal, Swagth*** *প্লাস্টিকের সকল প্রকার দ্রব্য এবং কম্পিউটার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, সকলপ্রকার ফার্নিচার সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।*
প্রো : সঞ্জয় গরাই
S. N. Road, Ukil Bari More, Natagarh, Sodepur, Kol - 113, Mob. - 7980267483

জল কিনে খান জল চিনে খান
কে এস ফুড প্রেডাক্ট-এর নতুন উদ্যোগে
মৌজিক একোয়া স্যুর
বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য যোগাযোগ করুন :
9830555230

Printed by Bipratip Dey, Published by Bipratip Dey, on behalf of (or owned by) Bipratip Dey and Printed at Mass Production House, S. V. Road, Chowdhuripara, Kalupukur, Barasat, Kolkata - 700 113 and published at C/o, Kalipada Dey, Benoypally, P.O. Natagarh, Sodepur, Dist. North 24 Parganas, Kolkata - 700 113, West Bengal, Editor : BIPRATIP DEY